শ্রীপাট শ্রীখন্ড

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রবীর আচার্য

শ্রীখন্ড একটি প্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত গ্রাম। বর্ধমান জেলার কাটোয়া থেকে প্রায় ছয় সাত কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে গ্রামটির অবস্থান। কাটোয়া অজয় এবং গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত শহর। আর শ্রীখণ্ড অজয় এবং গঙ্গা থেকে সমদূরবর্তী। প্রাচীন নদীমাতৃক কোনও সভ্যতার পুরাতাত্ত্বিক নজির শ্রীখন্ডে না পাওয়া গেলেও গ্রামটি প্রাচীন ইঁট বালির স্তুপের উপর নির্মিত যার প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কোনও দিনই হয় নি।[১] যার জন্য প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস উন্মোচিত না হলেও চৈতন্যোত্তর নিরবচ্ছিন্ন বৈষ্ণবেতিহাসের ধারা এখানে বজায় রয়েছে। কিন্তু সে ইতিহাসের পর্যালোচনাও আমরা এখানে করবো না। এটি কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক ভ্রমণবৃত্তান্ত; তবে কথা প্রসঙ্গে হয়ত কিছু প্রাচীন গাথা উঠে আসবে।

শ্রীখন্ড ভ্রমণে বের হয়ে আমরা প্রথমেই উপস্থিত হলাম নরহরি ঠাকুর স্মৃতি বিজড়িত ঠাকুরবাড়িতে। এই ঠাকুরবাড়ির গুরুত্ব বোঝাতে সামান্য ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা প্রয়োজন। ঠাকুর নরহরি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মের কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীখন্ডে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নরনারায়ণ দেব ও মাতা গৌরী বা গোয়ি দেবী। জ্যেষ্ঠভ্রাতা মুকুন্দের ব্যবস্থাপনায় তিনি নবদ্বীপে অধ্যয়ন করতে যান এবং অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার বলে সুপন্ডিত হয়ে ওঠেন। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় বেশকিছু শ্লোক ও পদাবলীও রচনা করেন।[২] পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে এসে তাঁর একজন মুখ্য পার্ষদ হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন চৈতন্যমঙ্গলের কবি লোচনদাসের বৈষ্ণবগুরু।[৩]

শ্রীখন্ডের ঠাকুরবাড়িতে উপস্থিত হয়ে আমরা ডাক্তার শীতল ব্যানার্জির[৪] ব্যবস্থাপনায় সাক্ষাৎ পেলাম গৌরগুণানন্দ ঠাকুরের পুত্র নিত্যানন্দ ঠাকুরের। তিনি উক্ত নরহরি দাসের জ্যেষ্ঠভ্রাতা মুকুন্দের চতুর্দশতম বংশধর, বর্তমান বয়স চুরানব্বই বছর। শ্রদ্ধেয় এই ব্যক্তিত্বের সম্মুখীন হয়ে আমরা শ্রীখন্ডের প্রাচীনতা সম্পর্কে অনেক তথ্যাদি সংগ্রহ করলাম যা ভিন্ন একটি প্রবন্ধের বিষয়। তিনি প্রকাশানন্দ ঠাকুরকে আমাদের পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করে দিলেন। প্রকাশানন্দবাবু শ্রীখন্ড উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, ওই ঠাকুরবাড়িরই বংশধর, তত্ত্বাবধায়ক এবং ভক্তি-রসাপ্লুত মনোহরশাহি কীর্তন ধারার শেষ মূলগায়েন এবং আচার্য। এই ভ্রমণ কাহিনির আরও অনেক তথ্য সরবরাহ করেছেন বাসন্তীদেবী।[৫]

শ্রীখন্ডের এই বৈষ্ণববৈদ্য বংশ প্রতিষ্ঠিত হয় খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতকে। প্রতিষ্ঠা করেন বল্লাল সেনের প্রদান সেনাপতি পন্থদাস। শ্রীখন্ডের বৈষ্ণবঠাকুর বাড়ির তিনটি ভাগ যথাক্রমে উত্তর বাড়ি, মাঝের বাড়ি ও দক্ষিণের বাড়ি। তিনটিই সমতল ছাদের মন্দির। উত্তর বাড়ির মন্দিরটি দক্ষিণ দুয়ারি এবং মন্দিরের প্রবেশ পথ পশ্চিম দিকে। এই মন্দিরের মূল বিগ্রহ মদন গোপাল ও রাধারানি। কষ্টি পাথরের তৈরি মদনগোপালের উচ্চতা প্রায় নয় ইঞ্চি এবং পিতলের রাধারানি আট ইঞ্চি মতো। ধাতব রাধারানি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের। মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রতিকান্ত ঠাকুর। তিনি হলেন নরহরি ঠাকুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা মুকুন্দ ঠাকুরের পঞ্চম বংশধর। মদনগোপালের সাথে একই সিংহাসনে অবস্থান করেছেন শ্যামরায় ও রাধারানি বিগ্রহ। এখানে রয়েছেন মুকুন্দদাসের নবম বংশধর অচ্যুতানন্দ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণ ও রাধাগোবিন্দ। এই ঠাকুরসেবা পরিচালনার জন্য কাশিমবাজারের রাজা সম্পত্তি দিয়েছিলেন। ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কাশিমবাজারের কান্তমুদি ও তাঁর পুত্রের সময়। এছাড়াও উত্তর বাড়িতে রয়েছে গোপাল ও শ্রীধর বিগ্রহ।

মাঝের বাড়ির মন্দির নরহরি ঠাকুরের ধ্যানাসন গৃহ বলে খ্যাত। এই মন্দিরের প্রবেশপথও পশ্চিম দিকে। উত্তর বাড়ি ও মাঝের বাড়ি মন্দিরের মাঝে রয়েছে সমতল ছাদের নাটমন্দির। মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বস্থ কক্ষটি তালাবন্ধ। ভিতরে নরহরি ঠাকুরের শয্যা এবং পাথরের বেদি আছে যার উপর বসে তিনি ধ্যান করতেন। সকাল সন্ধ্যা এখানে ধূপ ও আরতি দেওয়া হয়। এছাড়াও তার পাশের কক্ষে রয়েছে মদনমোহন ও রাধারানির বিগ্রহ। এই বিগ্রহ উত্তর বাড়ির মদনগোপালের সমসাময়িক এবং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বৃন্দাবনচন্দ্র ঠাকুর।

এরপরই দক্ষিণ বাড়ির মন্দির যেটি গোবিন্দজির মন্দির নামেও খ্যাত। এই মন্দিরের প্রবেশ পথ পূর্বদিকে পশ্চিমমুখো হয়ে প্রবেশ করেই সমতল ছাদের নাটমন্দির। নাটমন্দিরের উত্তরে প্রাচীন ভগ্ন মন্দিরের ধ্বংশাবশেষ এবং পশ্চিমে সমতল ছাদের মূলমন্দির। এখানে বড় কাঠের সিংহাসনে রয়েছে সারিবদ্ধ বিগ্রহ। পিছনের সারিতে শ্যামসুন্দর ও ধাতব রাধারানির মূর্তির পাশেই রয়েছে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দারুমূর্তি। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ডানদিকে নীচে গোপীনাথ বামদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া। সাধারণ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সাথে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মূর্তি অন্য কোথাও পূজিত হতে দেখা যায় না। গোপীনাথ সম্পর্কে একটি কিংবদন্তি আছে যে মুকুন্দদাসের পুত্র বালক রঘুনন্দনের হাতে তিনি নাকি নাড়ু খেয়েছিলেন। রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্যদেবের মানসপুত্র।

এই গৌরাঙ্গমূর্তি তৈরি করেছিলেন নরহরি সরকার ঠাকুর। তাঁর শিষ্য কুলাই নিবাসী কংসারি সেন তাঁর আদেশে বাড়ি প্রাঙ্গনে অবস্থিত নিম গাছ থেকে তিনটি গৌরাঙ্গমূর্তি তৈরি করান। বড়টি গদাধর দাসের শিষ্য

বিদ্যানন্দ পন্ডিত প্রতিষ্ঠা করেন কাটোয়ার গৌরাঙ্গবাড়িতে। ছোটটি নরহরি ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন দক্ষিণ বাড়ি মন্দির। মাঝারিটি পাঠানো হয় বগুড়া জেলার ভাগকোলায় বা গঙ্গানগরে। কিন্তু সেটি ১৩৫০ সালের ২৯শে শ্রাবণ বাংলাদেশ থেকে আনীত হয়ে উচ্চতর বাড়ির রঘুনন্দনের সুতিকা গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সেটি বীরভূমের বীরচন্দ্রপুর একচক্রা গ্রামে পূজিত হচ্ছে শ্রীখন্ডের বংশধরদের শরিকদের দ্বারা। বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন রঘুনন্দনের পুত্র কানাই ঠাকুর। তারপর রয়েছে গোবিন্দ ও রাধারানির মূর্তি। চৈতন্যপ্রসাদ ঠাকুর গোবিন্দজির বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মদনগোপাল প্রতিষ্ঠার ১০০ বছর পর। ঢাকা নিবাসী একজন ভক্তশিষ্য এই গোবিন্দজির প্রতিষ্ঠা ও সেবার জন্য সম্পত্তি দান করেছিলেন। তার পাশে মদনমোহন ও রাধারানি বিগ্রহ। পিছনের সারির এই মূর্তিগুলির উচ্চতা প্রায় আট নয় ইঞ্চির মধ্যে।

আর সামনের সারিতে রয়েছে দু তিন ইঞ্চি আকৃতির অনেক বিগ্রহ শালগ্রাম শিলা ইত্যাদি। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গোপাল, নিতাই, গৌর, রঘুনাথ প্রভৃতি। মন্দিরের একটি ফলক থেকে জানা গেল ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটির পূর্ণ সংস্কার হয়েছে।

দক্ষিণ বাড়ির মন্দিরের পশ্চিমে রয়েছে মধুমতী পুষ্করিণী। মন্দিরের পাশ দিয়ে পিছনে গেলে দেখা যায় বাঁধানো ঘাট। কথিত আছে নরহরি ঠাকুর এই পুষ্করিণীর জল মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দকে পান করতে দেওয়ায় তাঁরা মধুজ্ঞানে তা পান করেছিলেন।

ঠাকুরবাড়ির তিনটি মন্দির পরিচালনার দায়িত্বে আছে একটি ট্রাস্টি। রঘুনন্দন অছি পরিষদ নামে এই ট্রাস্টি বোর্ড সারা বছরের মধ্যে ২৯৩ দিন নিত্যসেবা, উৎসবাদি ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিচালনা করে। এসবের জন্য নীরদবরণ চ্যাটার্জি ও অজিত কুমার চ্যাটার্জি নামে দুজন পুরোহিত নিযুক্ত আছেন। এছাড়াও নিযুক্ত আছেন ভান্ডারী রাধামাধব কবিরাজ, ভোগ রাঁধুনি দীপালি গোস্বামী ও মাধব ঠাকুর, মন্দির পরিস্কারক বিশ্বনাথ সামন্ত প্রভৃতি। বাকি ৭২ দিন সবকিছু চলে বঙ্কু বিলাস ঠাকুরের পরিচালনায়।

এই ত্রয়ী ঠাকুরবাড়ি থেকে বের হয়ে আমরা দক্ষিণ দিকের কাঁচা রাস্তায় পড়লাম। এই রাস্তায় কয়েক কদম পশ্চিম দিকে এগোলেই পড়ে কাঁথেশ্বরী দুর্গামাতার মন্দির। প্রকাশানন্দবাবুর নিকট জানা গেল কাঁথেশ্বরী মূর্তিটি কাঁথ অর্থাৎ মাটির ঘরের পিছন দিকের দেওয়াল থেকে পাওয়া গেছিল বলে কাঁথেশ্বরী নাম। লক্ষণসেনের পবরর্তীকালে পন্থদাসের বংশে দুর্জয় দাশ মূর্তিটি উদ্ধার করেন। মন্দির ফলক থেকে জানা গেল ১৪০৯ বঙ্গাব্দে গীতা সেনগুপ্ত মন্দির পুনর্নির্মাণ করেছেন ঁভবানীনাথ, ঁসারথী, ঁশম্ভুনাথ ও ঁসঞ্জয় কুমার সেনগুপ্ত স্মরণে। শ্বেত পাথর দিয়ে বাঁধানো মন্দিরটি বেশ সুন্দর। কাঁথেশ্বরীর নিত্যপূজার দায়িত্ব পালন করেন মজুমদার ও বিশ্বাস পরিবার। দুর্গাপূজার সময় সাড়ম্বরে চারদিন পূজা হয় সপ্তমী ও নবমীতে পাঁটা বলি সহ। প্রায় পাঁচফুট উঁচু কাঠের সিংহাসনে ফুটখানেক উচ্চতার ধাতবমূর্তি মন্দিরের মাঝে বিরাজমানা। কাঁথেশ্বরী মন্দির থেকে সামান্য পশ্চিম দিকে গিয়ে রাস্তার উত্তরে পড়ে দক্ষিণদুয়ারি সিংহবাহিনী মন্দির। মন্দিরের সামনে উঠোন। সুমিত্রা রায় ও স্বপন রায় আমাদের মন্দির দর্শন ও তথ্যাদি সংগ্রহে সাহায্য করলেন। মন্দিরটি সমতল ছাদের একতলা গৃহবিশেষ। তার পশ্চিমের কক্ষে দশভূজা ধাতব মূর্তি ঘোড়ার মতো মুখওয়ালা সিংহের উপর বিরাজমানা। পাশে একটি গোপাল মূর্তি, তার নীচে শালগ্রাম শিলা ও সূর্যশিলা। এখানে বলি ছাড়া দুর্গাপূজার সমস্ত প্রথা পালিত হয়। নিত্যসেবা করেন সুশীল ঘোষাল। সিংহবাহিনী মন্দির প্রাচীন হলেও মূল মূর্তিটি ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে চুরি হয়ে যায়। পবিবর্তে একই ধাঁচের মূর্তি পুনরায় স্থাপন করা হয়। মূর্তির উচ্চতা আট ইঞ্চির মত।

এরপর আমরা উপস্থিত হলাম শ্রীখন্ডের ভূতনাথ মন্দিরে। মন্দিরটি গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে রাস্তার পশ্চিমে অবস্থিত। মন্দিরের সামনে প্রশস্ত গেট থেকে বেশ কিছুটা উঁচুতে মূল মন্দিরটি অবস্থিত। ঘেরা বেড়া প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যিখানে পশ্চিমদুয়ারি মূলমন্দিরের সামনে বিরাট বাঁধানো আটচালা। আটচালার উত্তর ও পশ্চিমে দুটি করে চারটি শিবমন্দির এবং দক্ষিণে একটি বাঁধানো ঘাটওয়ালা পুষ্করিণী। মূলমন্দিরটি চারকোনা এবং উঁচু চুড়াযুক্ত। মন্দিরে প্রবেশ করেই দেখা পেলাম পুরোহিত আনন্দগোপাল মুখার্জির। পূর্বমুখে মন্দিরে প্রবেশ করতেই সামনে দেখা গেল ভূতনাথ শিবলিঙ্গ। এটি কেতুগ্রাম বহুলা সতীপীঠের বহুলাক্ষ্মী দেবীর ভৈরব 'ভীরুক' বলে খ্যাত। প্রায় তিন ফুট উচ্চতার শিবলিঙ্গটি নাকি অনাদি লিঙ্গ অর্থাৎ মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। লিঙ্গের উপরিভাগের সামনের দিকটি বড়সড় পানপাতার মত এবং তেল সিঁদুরে মাখা হয়ে রক্তবর্ণ। এটি নাকি পার্বতীর প্রতীক। নীচে কোনও গৌরীপট্ট না থাকায় শ্বেত পাথরের টুকরো দিয়ে গোল করে বাঁধানো। এর পিছনেই অপেক্ষাকৃত ছোট মহাকাল নামে আর একটি শিবলিঙ্গ এবং উত্তর দিকের কুলুঙ্গীতে রয়েছে দুগ্ধকুমার নামে একটি শিবলিঙ্গ। চৈত্রমাসে গাজনের সময় এই দুগ্ধকুমার শিব ভূতনাথের প্রতিনিধি হিসেবে কাটোয়ায় গঙ্গাস্নানে যেতেন। সেখানে বিল্বেশ্বরের বিল্বনাথের দলের সাথে ভূতনাথের দলের প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ লেগে যেত। এরকম এক ঝগড়ার সময় দুগ্ধকুমার শিব পড়ে গিয়ে ভেঙে যায়। পড়ে শিবলিঙ্গটি সংস্কার করা হয়েছে কিন্তু গঙ্গাস্নান প্রথা তারপর বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়াও একই দিকের আরও দুটি কুলুঙ্গীতে রয়েছে আরও দুটি শিবলিঙ্গ। চাতালের পাশের উঁচু উঁচু

চাতালযুক্ত শিবমন্দির চারটিতেও চারটি শিবলিঙ্গ বর্তমান। প্রতিটি শিবমন্দিরের দেওয়ালে বসানো রয়েছে কালো পাথরের একটি করে শিলালেখা। তার মধ্যে মূলমন্দিরের দরজার উত্তরে প্রায় চারফুট উচ্চতায় বসানো রয়েছে রাজা রাজবল্লভের কালো গ্রানাইট পাথরের শিলালিপি। শিলালিপির খোদাইয়ের কাজ সুস্পষ্ট হলেও বাঁকাচোরা অক্ষরগুলির জন্য দুস্পাঠ্য। আমাদের দ্বারা যদ্দষ্টং তল্লিখিতং ভাবে যতটুকু পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

প্রাসাদসম কাবযত পবসস্থ
শ্রীভূতনাথস্য বৈষ্টেকদষ্টৌমম
হাধ্বকদিম যজ ঘোবাজপে
যী ফিতৌ। দাতাশ্রীযতরা
জ বল্লভ নৃপো হমাষ্টাববি
ন্দায্যমাশকেতর্কম
হীধ্র বাগবজনীনাথেবসাঘেসিতে

সঠিক পাঠোদ্ধার না করতে পারায় 'দাতা শ্রীযুক্ত রাজবল্লভ নৃপ' ছাড়া বাকি শব্দগুলির অর্থ আমরা বুঝতে পারলাম না। বাকি মন্দিরের শিলালেখগুলি অর্বাচীন কালের। চৈত্রমাসের ১৫ তারিখ থেকে শুরু করে পনেরোদিন ধরে এখান গাজন উৎসব চলে। এই সময় গ্রামের পনেরোটি পুকুরে নিয়ে গিয়ে শিবলিঙ্গলুলিকে স্নান করানো হত। গত তিন চার বছর পুকুরে আর নিয়ে যাওয়া হয় ন বরং ঐ পনেরোটি পুকুর থেকে জল এনে স্নান করানো হয়। বর্তমান পুরোহিত বংশ তিনপুরুষ ধরে এখানে নিযুক্ত আছেন। তার পূর্বে চক্রবর্তী পদবীযুক্ত এঁদের পিসেমশাই বংশ পূজা করতেন।

উত্তর পাড়ার জমিদার ও পরবর্তীকালে ভাগ্যকুলের জমিদারদের অর্থানুকূল্যে অতীতে মন্দির তৈরি হয়েছিল। নিত্যসেবা এবং উৎসবাদি চালাবার জন্য নাপিত পুরোহিত, বাদক এবং আনুষঙ্গিক সকলের জন্য চাকরাণ সম্পত্তি দেওয়া ছিল। কিন্তু বর্তমানে সে সম্পত্তি ভোগ করুন বা বেহাত হয়ে যাক দেবসেবায় তাঁরা সাহায্য করেন না। বর্তমানে পুরোহিত পরিবার নিজ খরচে সেবাপূজার দায়িত্ব চালান। ভক্তবৃন্দের কাছ থেকেও কিছু আয় হয়।

চড়কের পর পয়লা বৈশাখ একটি পাঁঠা বলি হয়। কিন্তু মজার কথা বলি হয় কামাক্ষ্যার রুদ্রভৈরবের উদ্দেশে মন্দির চত্তরের বাইরে এবং নীচে উত্তর দিকে একটি অশ্বত্থ তলায়।

ভূতনাথ মন্দিরের প্রবেশ পথের পূর্বদিকে রয়েছে একটি কালীমন্দির। প্রতি অমাবস্যায় এখানে পূজা হয়। এবং কার্তিক মাসে প্রতিমা তৈরি করে সাড়ম্বরে কালীপূজা হয় এই গ্রামেরই সরকার বাবুদের ব্যবস্থাপনায়।

এরপর আমরা রওনা হলাম খন্ডেশ্বরী তলার উদ্দেশে। খণ্ডেশ্বরী এগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী প্রাচীন দেবী। দেবীর নাম অনুসারে গ্রামের নাম হয় শ্রীখন্ড। অনেকের মতে অতীতে এই গ্রাম খন্ড খন্ড কয়েকটি পাড়ার সমন্বয়ে গঠিত ছিল বলে খন্ডগ্রাম নাম হয় এবং পরবর্তীকালে বৈষ্ণব প্রভাবে খন্ডগ্রাম শ্রীখন্ডে পরিণত হয়। যাইহোক এই গ্রামে খন্ডেশ্বরী দেবীর গুরুত্ব অপরিসীম। খন্ডেশ্বরীতলা ভূতনাথ তলার দক্ষিণে গ্রামের পশ্চিমাংশে ত্রিভুজাকৃতি একটি নীচু পাঁচিল ঘেরা পার্ক বিশেষ। তেরাস্তার সংযোগস্থলে পার্কের পূর্বপ্রান্তে পশ্চিম মুখে দন্ডায়মান প্রমাণ সাইজ নেতাজি মূর্তি। তিনি সামরিক পোশাক পরিহিত এবং একহাত দিল্লি চলো ডাকের ভঙ্গিতে উপরে তুলে আছেন। এটি অর্বাচীন কালের কীর্তি।

খন্ডেশ্বরীদেবী সারা বছর সেবাইতের বাড়িতেই অবস্থান করেন এবং নিত্যসেবা হয়। কেবল দোল পূর্ণিমার সময় খন্ডেশ্বরী তলায় দেবীকে আনা হয়। তখন পাঁঠাবলি সহকারে দেবীর পূজা উৎসব হয়। অন্ত্যজ সম্প্রদায়রা দেবীর উদ্দেশে শূকর মোষ ও হাঁস বলিও দেন। পাড়ার সকলে একসাথে মহোৎসব করে খাওয়া দাওয়া করেন। খন্ডেশ্বরীর মূল পুরোহিত হলেন গাঙ্গুলি পরিবার। কিন্তু বর্তমানে তাঁরা গ্রামে না থাকায় সে দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁদেরই আত্মীয় ও দৌহিত্র জীতেন ব্যানার্জি, অমিয় ব্যানার্জি প্রমুখরা। সেকারণে খন্ডেশ্বরী তিনমাস থাকেন মঙ্গলকোট থানার চৈতন্যপুরে, তিনমাস বনকাপাসি গ্রামে, বাকি ছয় মাস শ্রীখন্ড গ্রামে। দোল উৎসবের সময় খন্ডেশ্বরী মাতার মূল পূজার দায়িত্ব নেন জীতেন ব্যানার্জি, ঘোষেরা ও হাজরারা। দেবী গ্রামে না থাকায় ছবি তোলা হল না। খন্ডেশ্বরীদেবীর উচ্চতা পীঠসহ সাড়ে তিন ইঞ্চি থেকে চার ইঞ্চি। পদ্মাসনে উপবিষ্টা দেবীর চারটি হাত। উর্ধোত্থিত ডান হাতে ছিল উন্মুক্ত তরবারি এবং বাম হাতে আছে দন্ড। কিন্তু ডান হাতটি ভাঙা। দুই অস্ত্রের অগ্রভাগ মস্তকোপরি রত্নমুকুট সংলগ্ন হওয়াতে অর্ধচন্দ্রাকার বেড় তৈরি করেছে। বাম দিকের নিম্নবাহুটিও ভাঙা। দেবী কাঁচুলি পরিহিতা।

শ্রীখন্ডের সরকারিবাড়ি লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ ও শ্রীধরের খ্যাতি আছে। এই বংশের সদানন্দ সরকার লালবাবুদের সেরেস্তায় কাজ করতেন। তিনিই উক্ত শালগ্রাম বিগ্রহদ্বয় প্রতিষ্ঠা করে নিত্যসেবার ব্যবস্থা করেন। প্রথানুসারে ঝুলন, জন্মাষ্টমী, দোল, রাসপূর্ণিমায় সমারোহ ও উৎসহ হয়। সরকার বাড়ির বিগ্রহের বর্তমান সেবাইত সদানন্দ সরকারের দৌহিত্র বংশের উত্তরসূরি দেবাশিষ দাশগুপ্ত, পূর্ণাশিষ দাশগুপ্ত, শুভাশিষ দাশগুপ্ত প্রমুখরা।

সরকার বাড়ির মন্দির উত্তরদুয়ারি, সমতল ছাদের সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গন বসতবাটীর উঠোনের সাথে যুক্ত। এঁদের বাড়ির জগদ্ধাত্রী পূজায় খুব সমারোহ হয়। তখন অষ্টমী পূজার পর কুমারী পূজা হয়। জগদ্ধাত্রী মন্দির বাটীর বাইরে পশ্চিম-দুয়ারি। এখানে দুর্গা নবমীতেও ঘটে পূজা হয় চালকুমড়ো বলি সহকারে।

শ্রীখন্ডের রায়বাড়ির দুর্গাপূজা ঐতিহ্যমন্ডিত ও বহু প্রাচীন। রায় বংশের মহানন্দ রায় ছিলেন মহাপ্রভুর সমসাময়িক। তিনি নরহরি ঠাকুরের কাছ থেকে বৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহ পান। রায়বাড়ির মন্দির সংলগ্ন অংশ তৎকালে বনভূমি ছিল। মহানন্দ রায় সেই বনভূমি কেটে বসতি স্থাপন করেন এবং দুর্গাপূজার প্রতিষ্ঠা করেন। সেজন্য এঁরা বনকাটা রায় নামেও পরিচিত। এঁদের দুর্গোৎসব প্রায় ৫০০ বছরের পুরোনো বলে জানালেন বর্তমান বংশধর অশোক রায় ও বিকাশ রায়। রায়বাড়ির পাকা মন্দিরের একটি কক্ষে কাষ্ঠ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন কয়েকটি মূর্তি ও শালগ্রাম শিলা। এঁদের মধ্যে বৃন্দাবনচন্দ্রের মূর্তি ছয় ইঞ্চির মতো। আর রয়েছেন বংশীবদন (৭ ইঞ্চি প্রায়) ও রাধিকা (৫ ইঞ্চি প্রায়) এবং একটি গোপাল মূর্তি (৩ ইঞ্চি প্রায়)। এছাড়াও এই মন্দিরে একটি চার ইঞ্চি মতো উচ্চতার ধাতব দুর্গামূর্তিও রয়েছে। প্রায় পাঁচশত বছর ধরে এঁদের নিত্যসেবা চলে আসছে। আশ্বিন মাসে বড় মাটির প্রতিমায় দুর্গাপূজা হয় তবে কোনও বলিদান হয় না। দুর্গাষষ্ঠীর পূর্বে কৃষ্ণানবমীতে বোধন হয় এবং ঘট আসে। মহাষষ্ঠীর দিন পর্যন্ত ঐ ঘটেই দুবেলা নিত্যপূজা হয়। তারপর যথানিয়মে মহাসপ্তমী শুরু হয়।

কথিত আছে পাঁচশত বছর পূর্বে এই রায় পরিবার অথবা গুপ্ত পরিবারের কেউ বেনারস থেকে এনেছিলেন দুগ্ধকুমার শিবলিঙ্গ। এটিও এখানে প্রতিষ্ঠিত। এই দুগ্ধকুমার শিবলিঙ্গ। এটিও এখানে প্রতিষ্ঠিত। এই দুগ্ধকুমার শিবলিঙ্গ পূর্বোক্ত ভূতনাথ শিবলিঙ্গের ভাগ্নে বলে পরিচিত। গাজনের সময় পূর্বে এই লিঙ্গও কাটোয়া যেতেন ভূতনাথের প্রতিভূ হিসেবে গঙ্গাস্নানে। বর্তমানে এই প্রথা বন্ধ। গাজনে এখানে খুব ধুমধাম হয়, ভক্তরা দেহের বিভিন্ন জায়গায় বাণ ফোঁড়েন। একটি কিংবদন্তি আছে দুগ্ধকুমার লিঙ্গ বেনারস থেকে আনার পর হারিয়ে যায়। পরে স্বপ্নাদেশে জানা যায় মন্দির পার্শ্বস্থ কায়েতগড় নামক পুকুরে বিগ্রহটি রয়েছেন কিন্তু তাঁকে লোহার গন্ডী দিয়ে আটকে না রাখলে থাকবেন না। তাই একটি একটি লোহার গন্ডী দিয়ে বিগ্রহটি এখানে রাখা হয়। এই মন্দির চত্বরের সমস্ত বিগ্রহদের সেবার জন্য রায় পরিবার এবং গুপ্ত পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একটি ট্রাস্টি আছে। ট্রাস্টি সবকিছু পরিচালনা করে। ট্রাস্টি নিযুক্ত বর্তমান পুরোহিত হলেন আনন্দগোপাল মুখার্জি। শ্রীখন্ডের এই রায় পরিবার ও সরকার পরিবার রাঘব সেনের বংশধর। দ্বাদশ শতকে রাঘব সেন ছিলেন পূর্বোক্ত বৈষ্ণববৈদ্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা পন্থদাশের সমসাময়িক।

এরপর আমরা গেলাম সখীর আখড়া নামে একটি আশ্রমে। এখানে পূর্বমুখী একটি ছোট ঘরের ভিতর একটি কাঠের সিংহাসনে থাক থাক করে সাজানো রয়েছে কিছু মূর্তি। প্রতি থাকে সারিবদ্ধ ভাবে মূর্তিগুলি সাজানো। সবার উপরে পর পর দুটি থাকে সাজানো আছে একই রকম অষ্টধাতুর রাধাকৃষ্ণ মূর্তি। তার নীচে তৃতীয় থাকে রয়েছে গৌরাঙ্গ ও নিতাই এর দারুমূর্তি। চতুর্থ থাকে গৌর নিতাই, শ্রীনিবাস ও হরিদাস। সবার নীচের থাকে দুটি গোপাল ও একটি খোল বাদকের মূর্তি পাশে রাধাবল্লভ গোস্বামীর ছবি। এই বৈষ্ণব আশ্রমটিও বহু প্রাচীন। আশ্রমিকরা ভিক্ষা উপজীবী তবে কিছু জমিও আছে আশ্রমের নামে। বর্তমানে আশ্রমিক হলেন মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী। তাঁর দুজন বৈষ্ণবী আরতি বৈরাগ্য ও নমিতা বৈরাগ্যের নৈপুণ্যে আশ্রমটি গার্হস্থ্যরূপ ধারণ করেছে। এখানে শিবরাত্রি ও জন্মাষ্টমীতে অষ্টপ্রহর হরিনাম ও মহোৎসব হয়। আর নিত্যসেবা তো আছেই।

সবশেষে আমরা হাজির হলাম হাড়িবাড়ি ধর্মরাজতলায়। এখানে পশ্চিমদুয়ারি একটি ছোট মাটির ঘরে কাঠের সিংহাসনে তেলসিঁদুরে রাঙানো তিনটি শিলা ধর্মরাজের প্রতীকরূপে পূজিত হয়। নিত্য ফলজল দেন বোধন হাজরা ও তাঁর স্ত্রী পুষ্প হাজরা। তবে বৈশাখী পূর্ণিমায় ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা করানো হয়। গাজনে সমারোহ করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। পাঁঠাবলির ব্যবস্থাও আছে। আবার মানতের সুয়োর বলিও হয়।

কবি কুমুদরঞ্জনের জন্মস্থান এবং কর্মস্থান কোগ্রাম হলেও শ্রীখন্ড গ্রামটি হল কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের পিতৃভূমি। আবার তাঁর সেজ পুত্রবধূ বাসন্তীদেবীর (ডাকনাম শঙ্করী) পিত্রালয়। তাঁর বক্তব্য অনুসারে কুমুদরঞ্জন মল্লিকের পিতৃভূমির সঠিক অবস্থান নির্ধারণ করা যায় নি। তবে পঞ্চায়েত অফিসের কাছে কুমুদরঞ্জনের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর বাসস্থান আছে।[৫]

শ্রীখন্ড গ্রামটির দক্ষিণপূর্বে এক কিলো-মিটারের মধ্যে মাঠের মাঝখানে বড়ডাঙ্গা আশ্রম। একটি বিশাল বটগাছের পাশেই ঘেরা বেড়া আশ্রম। এখানে উঁচু চাতাল যুক্ত বেশ উঁচু মন্দির রয়েছে। মন্দিরে সারা বছর কোনও বিগ্রহ থাকে না। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে শ্রীখন্ডের দক্ষিণবাটির মন্দির থেকে গোপীনাথজি এবং গৌরাঙ্গ বিগ্রহ তিন দিনের জন্য এখানে আসেন। চিঁড়েমহোৎসব, অন্নমহোৎসব ও ধুলোট এই তিন দিন মেলা বসে এবং কীর্তন সহকারে মহোৎসব হয়। এই মহোৎসবের প্রবর্তক শ্রীনিবাস আচার্য এবং একে বলা হয় নরহরির বার্ষিক মহোৎসব। মূল মন্দিরের পাশে ছোট একটি কুঠুরিতে মহাপ্রভুর দারুমূর্তি ও গিরিধারী মূর্তি আছে। নিত্যসেবা করেন বর্তমান সেবাইত সুভাষ দাস বাবাজি। বড়ডাঙ্গাকে নরহরি বিলাসকুঞ্জ বলা হয়। এখানেই বসে কবি

লোচনদাস প্রথমে গৌরলীলা বিষয়ক কিছু পদ রচনা করেন যা দেখে তাঁর গুরু নরহরিদাস বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। পরবর্তীকালে গুরুর আদেশে লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গল কাব্য রচনা করেন কোগ্রামে তাঁর বাড়িতে কুলতলায় বসে।

পূর্বে বড়ডাঙ্গা একটি নির্জন বনভূমি ছিল। এখানে মুকুন্দ নরহরি প্রমুখেরা ভজন সাধন করতেন। মুকুন্দকে শ্রীবৃন্দাদেবীর অবতার হিসেবে বৈষ্ণবরা মানেন সেজন্য বড়ডাঙ্গাকে তাঁরা দ্বিতীয় বৃন্দাবন বলেন। এখানে মুকুন্দ পুত্র রঘুনন্দনের সাথে অভিরাম গোস্বামীর মিলন হয়।

তথ্যপঞ্জী

১। শারদীয়া কাটোয়া দর্পণ ১৯৮৪-তে প্রকাশিত প্রবন্ধ – 'লোকে কহি এ গ্রামের বৈদ্য খন্ড নাম' -ড. কালীচরণ দাস। ড. দাস কাটোয়া কলেজের পদার্থবিদ্যার প্রাক্তন অধ্যাপক এবং প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক। তিনি কাটোয়া এবং সন্নিহিত অঞ্চলের জীবন্ত জীবাশ্ম। মূলত তাঁর নির্দেশেই শ্রীখন্ড ভ্রমণ করে এ কাহিনির অবতারণা। যাবতীয় তথ্যাদির ব্যাপারেও আমরা তাঁর কাঠে ঋণী।

২। শ্রীখন্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব : শ্রী গৌরগুণানন্দ ঠাকুর এই বইটি থেকে বহু তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে।

৩। সতীতীর্থ বৈষ্ণবতীর্থ কবিতীর্থ : কোগ্রাম –ড. কালীচরণ দাস ও প্রবীর আচার্য - কুশল কুমাদ-১২৫তম জন্মবর্ষের স্মারক পত্রিকা।

৪। ডাক্তার শীতল ব্যানার্জির আদিবাড়ি কলকাতা। দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ তিনি শ্রীখন্ডে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় চালাচ্ছেন উক্ত ঠাকুরবাড়ির প্রবেশ পথেই। তাছাড়া তিনি শ্রীখন্ডের নানারকম উন্নয়নমূলক কাজকর্মে লিপ্ত। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের শিষ্য এবং তাঁর চিকিৎসালয়ের সম্মুখেই রামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রমের শাখা স্থাপন করেছেন যেখানে প্রথামাফিক রামকৃষ্ণ-সারদা ভজনা হয় নিত্য নৈমিত্তিক।

৫। বাসন্তীদেবী শ্রীখন্ডের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবৈদ্য বংশের কন্যা। তাঁর পিতার নাম সচ্চিদানন্দ ঠাকুর। তিনি বর্তমানে নিত্যানন্দ ঠাকুরের পাশের বাড়ি তাঁর পিত্রালয়ে থাকেন। আশি বছর বয়স্কা এই মহিলা তথ্য সরবরাহ ছাড়াও অনেক ভ্রম সংশোধন করে দিয়েছেন।